ভারতের উন্নয়ন ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বঞ্চিতের কাতারে

সৌম্য দত্ত

উন্নয়ন ধরনের সাথে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ নীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সেজন্য বিভিন্ন দেশে জ্বালানী সম্পদ আহরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা দেখা দেয়। কাদের স্বার্থে, কাদের মালিকানায় বা কর্তৃত্বে সম্পদ আহরণ হচ্ছে, তার সাথে কোন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তার ওপর ফলাফলে তারতম্য হয়। সেই একই কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লেও তার সুফল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নাও পেতে পারে। বরং নির্বিচার পদ্ধতি গ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মানুষ ও প্রকৃতি। ভারতের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাত নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও জনআন্দোলনে যুক্ত আছেন বিজ্ঞান গবেষক সৌম্য দত্ত। বাংলাদেশে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের আন্দোলনে তিনি সংহতি জানিয়ে লিখেছেন, বাংলাদেশে লংমার্চেও অংশ নিয়েছেন। সর্বজনকথার পক্ষ থেকে মাহা মির্জা ভারতের অভিজ্ঞতা জানতে তাঁর সাথে কথা বলেছেন। নীচে এই কথোপকথন প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছেন আতীয়া ফেরদৌসী চৈতী।

মাহা মির্জা: বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। ভারত গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য আকারে কয়লা ও নিউক্লিয়ারভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখযোগ্য আকারে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে?

সৌম্য দত্ত: বিদ্যুৎ/এনার্জি সাপ্লাইয়ের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অনস্বীকার্য সম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু এই প্রয়োজন অনেকাংশেই নির্ভর করে 'কী ধরনের উন্নয়ন' পন্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করছে এবং এর উন্নয়ন লক্ষ্য। যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয় তথাকথিত ৮ লেনের মহাসড়ক, 'বিশ্বমানের অবকাঠামো', বৃহৎ বিনোদন পার্ক এবং শপিং মল ইত্যাদি, তাহলে বস্তুতই অধিক বিদ্যুতের প্রয়োজন–কেবল এই সব চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই নয়, বরং এসবের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণে স্টিল, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম, পেট্রোকেমিক্যাল ইত্যাদি উৎপাদনেও বিদ্যুতের দরকার রয়েছে। যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয় রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, যা দিয়ে বাসাবাড়ির বাতি জ্বালানো সম্ভব, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে ভালো উপার্জন তৈরি করা সম্ভব এবং স্থানীয়ভাবে অসংখ্য কাজের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব, চিকিৎসা ও শিক্ষাসেবা প্রদান করা সম্ভব ইত্যাদি; তাহলে একই মানের উন্নয়ন অর্জন করতে অনেক কম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে।

প্রতিটি সমাজের জন্যই বিদ্যুৎ দরকার, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ভর করে উন্নয়ন লক্ষ্যের ওপর। পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালেই। তারা ভারতের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত এইচডিআই (মানব উন্নয়ন সূচক) মাত্রা অর্জন করেছে ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচের ২/৩ ভাগের ১ ভাগ মাত্র খরচ করেই

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রতিটি সমাজের জন্যই বিদ্যুৎ দরকার, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ভর করে উন্নয়ন লক্ষ্যের ওপর। পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালেই। তারা ভারতের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত এইচডিআই (মানব উন্নয়ন সূচক) মাত্রা অর্জন করেছে ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচের ২/৩ ভাগের ১ ভাগ মাত্র খরচ করেই। সারা পৃথিবীতে এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। এবং অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, এইচডিআই স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সাথে জীবনমান/আয়কেও উন্নয়নের সূচক হিসেবে গণনা করে। কোনো রকম রায় ঘোষণা না করে আমরা কিছু তথ্য বা চিত্র এখানে দেখাতে পারি।

২০১৬ সালে এই সক্ষমতা ৩ লাখ ১০ হাজার মেগাওয়াট, যা ১৯৯১ সালের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি, এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ শতাংশ মানুষ (৩০০ মিলিয়ন) এই বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। এই উদাহরণ মোটেই অনুসরণীয় নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি মধ্যম এইচডিআই মাত্রায় ০.৫৭০ তে অবস্থান করছে, যার মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা/বছর। ভারত মধ্যম এইচডিআই মান ০.৬০৯-এ পৌঁছেছে, যখন তার মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৭৭০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা/বছর। এটা বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা বেশি এইচডিআই মাত্রা হলেও ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার তার চেয়ে প্রায় ২৫০ শতাংশ বেশি! এবং যেখানে সমাজে প্রচণ্ড রকম অসমতা বিদ্যমান। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা একটি উন্নত এইচডিআই মাত্রায় ০.৭৫৭ পৌঁছেছে, যখন তাদের জনগণের মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ৫৫০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা/বছর, যা ভারতের মাত্র ৭১ শতাংশ। বাংলাদেশ কোন পথ বেছে নেবে তা তার নিজের সিদ্ধান্ত, যেখানে আবার জড়িত রয়েছে ভয়াবহ পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির কারণ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ সক্ষমতা গত ২৫ বছরে বেড়েছে পাঁচ গুণ, যা জিডিপির বৃদ্ধিতে মৌলিক ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু যদি আমরা সুবিধাবঞ্চিত/দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যে চিত্রটি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৯১ সালে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল ৬৫ হাজার মেগাওয়াট, যখন ৫৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী ছিল এর আওতার বাইরে। ২০০১ সালে উদারনীতিকরণ, বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের ১০ বছরের মাথায় এই সক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ১ লাখ ২ হাজার মেগাওয়াটে, যেখানে বিদ্যুতের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ছিল ৪৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে এই সক্ষমতা ৩ লাখ ১০ হাজার মেগাওয়াট, যা ১৯৯১ সালের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি, এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ শতাংশ মানুষ (৩০০ মিলিয়ন) এই বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। এই উদাহরণ মোটেই অনুসরণীয় নয়।

এই সময়েও প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতীয় জনগণের আয় দৈনিক ১.২৫ ইউএস ডলারেরও নিচে (বৈশ্বিকভাবে গৃহীত দারিদ্র্য সূচক) বা ১০০ রুপির নিচে, যদিও তাদের জাতীয় মাথাপিছু আয় বছরে ৯৩ হাজার বা দিনে ২৫৫ রুপি। অথচ একটি বড় অংশের জনগোষ্ঠী এখানে অপুষ্ট এবং মানব উন্নয়ন সূচক কেবল মাঝারি অবস্থানে পৌঁছেছে। এটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, যদি বিদ্যুৎ বা এনার্জি সাপ্লাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

কাছে পৌঁছাতে না পারে তাহলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বস্তুত বর্তমান ভারতীয় বৈদ্যুতিক বাজারে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে এবং একই সাথে এখানে অন্ধকার ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত বঞ্চিত এবং অপর্যাপ্ত সুবিধার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠী বিদ্যমান আমাদের স্বাধীনতার এই ৭০ বছর পরও। সার্বিকভাবে ধনী ও মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের মাথাপিছু ব্যয় ক্রমশ উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে, যা অধিকাংশ বাড়তি উৎপাদন ও সক্ষমতা শুষে নিচ্ছে। পুরোপুরি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত এবং আলোকোজ্জ্বল শপিং মলের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যুৎ অপচয়ী এয়ারকন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদি এখন মধ্যবিত্ত ঘর দখল করে ফেলেছে। এই ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ও অবকাঠামোতে জনগণের অসম প্রবেশাধিকার স্পষ্ট, অথচ এই ইন্ডাস্ট্রি মূলত গড়ে উঠেছে সর্বজনের টাকায়, সব রকমের পরোক্ষ করের টাকায়, যা দরিদ্রদেরও বহন করতে হয়েছে।

বর্তমান ভারতীয় বৈদ্যুতিক বাজারে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে এবং একই সাথে এখানে অন্ধকার ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত বঞ্চিত এবং অপর্যাপ্ত সুবিধার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠী বিদ্যমান–আমাদের স্বাধীনতার এই ৭০ বছর পরও।

মাহা মির্জা: ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানবিহীন এবং বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আবার দীর্ঘদিন ধরেই কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আমরা বিশাল আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে উঠতে দেখেছি। এক দিকে শিল্পায়নভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনে বিদ্যুতের বিপুল চাহিদা, আরেক দিকে বিপুলসংখ্যক মানুষের কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা। বিদ্যুৎভিত্তিক এই উন্নয়ন দর্শনে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন?

সৌম্য দত্ত: বিদ্যুতের ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মূলত তৈরি হয় সম্পদ/টাকার পুঞ্জীভবন এবং নগরায়ণের মাত্রার ফলে। ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা যা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হলো ১৯৭০ ও ৮০ পর্যন্ত বৃহৎ গ্রামভিত্তিক সমাজের উন্নয়ন (যা অনেকটা বর্তমান বাংলাদেশের মতো) সাধিত হয়েছে সেবা খাতের উন্নয়নের ওপর ভর করে, যা চীনের বিদ্যুৎ-নির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন। সেবা খাতের ক্ষেত্রে একই মাত্রার উন্নয়নের জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মতো বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। যুগপৎভাবে সেবা খাত প্রচুর সংখ্যক জরুরি ভিত্তিক চাকরিক্ষেত্র তৈরি করে, যা মধ্যম বা ভারী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত স্বল্প বিদ্যুৎ খরচে তৈরি করতে অক্ষম। এবং কৃষিভিত্তিক ছোট ইন্ডাস্ট্রি খাত খুব কম বিদ্যুৎ খরচে দ্রুত প্রবৃদ্ধি তৈরি করতে পারে, যা আবার লাখ লাখ মানুষের হাতে আয়ের অর্থ তুলে দেয়, দারিদ্র্য দূর করে–যা এসডিজির (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য) প্রথম লক্ষ্য। মূলত এই কৌশলটি মূলগতভাবে এসডিজির প্রথম চারটি লক্ষ্যই একই সাথে পূরণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে বনাঞ্চলের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়েছে খনির কাজের জন্য, তিন-চারটি সম্পূর্ণ গ্রাম অধিগ্রহণ করা হয়েছে মেগা পাওয়ার প্লান্ট সৃষ্টির জন্য। এর ফলে লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘর, খামার, কৃষিক্ষেত ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়েছে, যা তাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটি অধিকতর ভালো জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারত এবং যা বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিগুলোর অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্র দিতে পারছে না। ভারতে বর্তমানে ৯০ শতাংশের অধিক কর্মক্ষেত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক, যার বেতন অনিয়মিত এবং নগণ্য, খুবই সীমিত সামাজিক বা চাকরির সুরক্ষা, শ্রম অধিকার বা অন্যান্য আইনগত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়–যেখানে বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ১০ শতাংশেরও কম পরিমাণ কাজের সুযোগকে ভালো বা উপযুক্ত বলা যেতে পারে।

ভারতে বর্তমানে ৯০ শতাংশের অধিক কর্মক্ষেত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক, যার বেতন অনিয়মিত এবং নগণ্য, খুবই সীমিত সামাজিক বা চাকরির সুরক্ষা, শ্রম অধিকার বা অন্যান্য আইনগত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়–যেখানে বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ১০ শতাংশেরও কম পরিমাণ কাজের সুযোগকে ভালো বা উপযুক্ত বলা যেতে পারে।

ভারতে গ্রামীণ (কৃষি ও কারিগরি) অর্থনীতিতে একটি তীব্র দুরবস্থা যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে অন্তত ২৫ শতাংশ জিডিপি এসেছে কৃষি খাত থেকে, যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল ৭০ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে ১৪ শতাংশ জিডিপি আসছে এই খাত থেকে, যার সাথে জড়িত রয়েছে ৬০ শতাংশ মানুষ। স্পষ্টতই যে 'উন্নয়ন পথ' আমরা বেছে নিয়েছি তা গ্রামীণ এবং ছোট-মাঝারি কৃষকদের দরিদ্র করে চলেছে, যারা এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ। খুব স্পষ্টতই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন। যদি আমরা সামাজিক দুর্যোগকে প্রতিহত করতে চাই তাহলে দ্রুত এবং মূলগতভাবে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ও ধারা পরিবর্তন করতে হবে।

মাহা মির্জা: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত দূষণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য আকারে হ্রাস পায়। আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষতি নিয়ে কাজ করছেন। ভারতে সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে বায়ু ও পরিবেশদূষণ ঠিক কতটা কমে আসতে পারে?

সৌম্য দত্ত: তাদের দাবি সত্ত্বেও ভারতের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখায় যে সুপারক্রিটিক্যাল বয়লার প্রযুক্তি (বাষ্পের অতি উষ্ণায়ন), একই বিদ্যুৎ মাত্রায় সাবক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে মোটেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লার ব্যবহার হ্রাস করে না। বাস্তব উদাহরণ, যেমন–টাটা-মুন্দ্রা, রিলায়েন্স সাসান ইত্যাদি থেকে আমরা দেখতে পাই, ৩-৫ শতাংশ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্ট্রা সুপারক্রিটিক্যাল এটিকে কিছুটা উন্নত করেছে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যয়বহুল।

কিন্তু দূষণের প্রশ্নটি আলাদা। যদি সুপারক্রিটিক্যাল প্লান্ট উচ্চ-ছাই জাতীয় উপাদানে পূর্ণ কয়লা ব্যবহার করে (যেমনটি ভারতীয় কয়লা), স্পষ্টতই ক্ষুদ্রকণা থেকে সৃষ্ট দূষণ হবে অনেক বেশি, যদি না বিভিন্ন ফিল্টার যেমন–সাইক্লোন ফিল্টার, ইএসপি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় (যা সাবক্রিটিক্যালের ক্ষেত্রেও করা সম্ভব)। ভারী ধাতু, যার মধ্যে রয়েছে স্নায়ুঘাতী পারদ, তা নির্গত হয়ে মাটি ও পানিতে মিশে যাবে এবং ফলস্বরূপ অবশ্যই তা মানব শরীরে প্রবেশ করবে, এর ফল কিডনি, মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন হওয়া। এই ঘটনা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কয়লাখনি ও দাহ করার স্থানগুলোতে দৃশ্যমান; যেমন–মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলি, ওড়িশার আঙ্গুল-তালছের ইত্যাদি। কয়লার মধ্যে থাকা সালফার আরেকটি বড় দূষণের কারণ, যার ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে এবং খুব অল্প কিছু প্লান্ট ব্যয়বহুল এফজিডি (ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এই সব দূষণকারী পদার্থ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, যখন তা কোনো জলাশয়ে, কৃষিজমিতে পতিত হয়। এটি বিশেষত স্নায়ুঘাতী বিপজ্জনক পারদের জন্য সত্য, যা এই পরিবেশে প্রাণঘাতী মিথাইল মার্কারিতে

পরিণত হয়। জাপানের ট্র্যাজিক মিনামাতা দুর্ঘটনার কথা কে ভুলতে পেরেছে? কোনো সন্দেহ নেই, কিছু উপযুক্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তি আজকাল পাওয়া সম্ভব তা সুপারক্রিটিক্যাল হোক বা না হোক, কিন্তু তা তৈরি ও পরিচালনা–দুটোই যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে আমরা দেখতে পাই, যখন দূষণ পরীক্ষণ কর্মকর্তার পরিদর্শনের সম্ভাবনা নেই, তখন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রায়শই খরচ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে এসব প্রযুক্তি বন্ধ রাখে। কেউ যদি কেবল মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে রিলায়েন্স সাসানের 'আধুনিক সুপারক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট' দেখতে আসেন, তাহলে প্রতিনিয়ত দূষণ সৃষ্টিকারী কালো ধোঁয়ার নির্গমন সহজেই চোখে পড়বে। এগুলো সম্পর্কে ছবি ও রিপোর্ট স্থানীয় পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে, কিন্তু যখন 'ধনী'রা সরকারি ব্যবস্থা কিনে নিতে পারে, তখন কে তা থোড়াই কেয়ার করে? দুর্নীতি আরো নানাভাবে পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলছে।

কেউ যদি কেবল মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে রিলায়েন্স সাসানের 'আধুনিক সুপারক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট' দেখতে আসেন, তাহলে প্রতিনিয়ত দূষণ সৃষ্টিকারী কালো ধোঁয়ার নির্গমন সহজেই চোখে পড়বে।

মাহা মির্জা: ভারত ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ৪৫ বছরের ধারাবাহিক সক্ষমতা চর্চা করার মাধ্যমে আজ প্রায় ৭ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। অথচ বাংলাদেশ ২০২০ সালের পর শূন্য মেগাওয়াট ক্ষমতা থেকে আমদানি প্রযুক্তির (ইম্পোর্টেড টেকনোলজি) নির্ভরতায় মাত্র ২১ বছরের ব্যবধানে ৭ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্লান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, অতিরিক্ত প্রারম্ভিক ব্যয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং সার্বিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কতটুকু বাস্তবতাসম্পন্ন বলে মনে করেন?

সৌম্য দত্ত: এই প্রশ্নটির কিছু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত আছে। একটি হচ্ছে পারমাণবিক প্রতিশ্রুতি এবং সরবরাহের মধ্যে বিপুল ফারাক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশাল এবং ব্যবস্থাপনার অযোগ্য ঝুঁকি, যা নিউক্লিয়ার পাওয়ারের সাথে সব সময়ই জড়িয়ে থাকে, যার দৃশ্যমান পরিণতি আমরা দেখেছি ফুকুশিমা ও চেরনোবিলে। তৃতীয়টি হচ্ছে মারাত্মক ব্যয়বহুল অবকাঠামো, যা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন, অন্যগুলো এ ক্ষেত্রে বিবেচনা না করলেও চলবে।

ক) ভারতীয় পারমাণবিক স্থাপনা জোরালোভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় একটি জমকালো বৃহদাকার পারমাণবিক ক্ষেত্রের। প্রাথমিকভাবে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম ১৯৮০ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব, ২০০০ সালে এসে তা দাঁড়াল ৪০ হাজার মেগাওয়াটে এবং এখন এই প্রতিশ্রুতি এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে আমরা ৬৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব।

পারমাণবিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৬০ বছর পর ভারত এই ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট দিকে দক্ষতা তৈরি করেছে, যা বিপুল অর্থনৈতিক (এবং পরিবেশগত) ব্যয় তৈরি করেছে, কিন্তু এখনো তারা এতে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি

সত্যিকারের চিত্র হলো, ২০১৬ সালে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৭ হাজার মেগাওয়াট। এর কারণগুলো খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কোনো কাজ নয়। এই প্রযুক্তিটি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা খুবই জটিল (যদিও এর পেছনের পদার্থ বিজ্ঞানটি অপেক্ষাকৃত সরল) এবং এর জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প খাতের সক্ষমতা। পারমাণবিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৬০ বছর পর ভারত এই ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট দিকে দক্ষতা তৈরি করেছে, যা বিপুল অর্থনৈতিক (এবং পরিবেশগত) ব্যয় তৈরি করেছে, কিন্তু এখনো তারা এতে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি (যেমন–জ্বালানি চক্র)। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এই পারমাণবিক স্থাপনা খুব ধীরগতিতে হেলেদুলে ২০৩০ সাল নাগাদ ১৪ থেকে ১৮ হাজার মেগাওয়াটের টার্গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

খ) এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হওয়া ফুকুশিমা দুর্যোগের পাঁচ বছর পরও মধ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহ নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য ঝুঁকির পুরোটা প্রকাশিত হয়নি। উন্নত এসঅ্যান্ডটি ক্ষমতা, উচ্চমাত্রার প্রতিশ্রুতি এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং উচ্চ আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও জাপান সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রি এখন পর্যন্ত ফুকুশিমার ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান ইউক্রেন) চেরনোবিল দুর্ঘটনা এত বেশি ক্ষতিকর ও ব্যয়বহুল ছিল যে গর্বাচেভ একসময় উল্লেখ করেছিলেন, এই চেরনোবিলই প্রকারান্তরে সোভিয়েতের ভাঙন ডেকে এনেছে। নিউইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্স ২০০৯ সালে হাজারখানেক গবেষণাপত্র ঘেঁটে একটি পিয়ার রিভিউড পেপার প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয়ার ফলে আমরা মানবপ্রাণ হারিয়েছি প্রায় ৯ লাখ ৫০ হাজার। কারো পক্ষে এই ক্ষতির পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তবে ক্ষতির ভয়াবহতাটি পরিষ্কার। এই ঝুঁকিগুলো কেবল দুর্ঘটনার ফলেই তৈরি হয় না। নিয়মিত ও প্রক্রিয়াগত কারণে নির্গত হয় (যাকে বলা হয় ভেন্টিং) বিপুল পরিমাণ উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন মাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য।

(প্রযুক্তির কাছে যেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার উপায় জানা নেই, বরং এগুলোকে 'নিরাপদে মজুদ করে এবং দুই লাখ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে রাখাই' একমাত্র সমাধান। যেমন–প্লুটোনিয়াম ২৩৯ তৈরি হয় উপজাত হিসেবে এবং এর আয়ুষ্কাল প্রায় ২৪ হাজার বছর এবং ১০টি অর্ধ আয়ুষ্কাল প্রয়োজন এর নিরাপদ মাত্রায় আসতে)।

গ) বৃহৎ জইতাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎক্ষেত্র, যা ফ্রান্সের ইডিএফ/এআরইভিএ থেকে 'আমদানীকৃত প্রযুক্তি ও রিঅ্যাক্টর' ব্যবহার করে ভারতীয় সরকার নির্মাণ করার চেষ্টা করছে, তা বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে প্রতি কিলোয়াট-ঘণ্টা ৯ রুপির অধিক মূল্যে। বর্তমানে দর-কষাকষি চলছে কিভাবে কতটা লুকানো ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে, যাতে 'দৃশ্যত খরচ' প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা ৬.৫০ রুপিতে নামিয়ে আনা যায়। বিশ্বের বৃহত্তম এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় (যদি তা কখনো আদৌ নির্মিত হয়) রক্ষণশীলভাবে ধরা হয়েছে প্রতি মেগাওয়াট ৩০-৪০ কোটি রুপি (একই সরবরাহকারীর নকশায় যুক্তরাজ্যের হিঙ্কলি পয়েন্ট সির খরচ ধরা হয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার কোটি ভারতীয় রুপি (বিপি ১৮ বিলিয়ন) বা প্রায় ৫০ কোটি/মেগাওয়াট।

বর্তমানে সৌরচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে ৪.৬ থেকে ৫ রুপি/কিলোওয়াট-ঘণ্টা হারে। এর নির্মাণ খরচ যে কোনো স্থানে প্রতি মেগাওয়াটে ১০-১১ কোটি। বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র এমনকি এর চেয়েও সুলভ।

যদি বাংলাদেশ এই ধরনের আমদানিনির্ভর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে চায়, সেটি কেবল বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণই

হবে না (যেখানে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় তিন গুণ), সেই সাথে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও ধ্বংস করে ছাড়বে।

মাহা মির্জা: ভারত সরকার সাম্প্রতিক কালে নতুন করে সৌর ও বায়ু থেকে প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের প্রসারে ভারত কি রোল মডেল হতে যাচ্ছে?

বর্তমানে ভারতের নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৪৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ১ লাখ ৭৫ হাজার মেগাওয়াটে পরিণত করার টার্গেট নেয়া হয়েছে।

সৌম্য দত্ত: বর্তমানে ভারতের নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৪৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ১ লাখ ৭৫ হাজার মেগাওয়াটে পরিণত করার টার্গেট নেয়া হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সৌর জোটও গঠন করেছে। সৌর বিদ্যুতের খরচ দিন দিন কমে আসছে। যদি ভারত তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়, এমনকি ৭০ শতাংশও অর্জন করতে পারে, তাহলে ভারতের আগামী অন্তত ১৫ বছরের জন্য কোনো কয়লা, পারমাণবিক বা বৃহৎ বাঁধনির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন হবে না। আমি এই সব তথ্য ও চিত্র গত এক বছরে অনেকগুলো ফোরামে দেখিয়েছি, এবং এখন ভারতের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিদ্যুৎ বিষয়ক নীতিনির্ধারকরা সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন, সেখানে বলা হচ্ছে ২০২২ সাল পর্যন্ত (এমনকি তা ২০১৬ পর্যন্তও হতে পারে) ভারতের কোনো কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজন নেই।

আমরা ভারতীয় সুন্দরবন অংশের কাছে এ ধরনের কোনো কয়লা প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাব।

মাহা মির্জা: আপনি বেশ কয়েক বছর ধরেই রামপালবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এ বছর মার্চে জাতীয় কমিটির ডাকে সংগঠিত হওয়া চার দিনব্যাপী লংমার্চে ১২ জনের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আপনিও ছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আমরা একাধিক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশবাদী সংগঠনকে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা করতে দেখেছি। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন এই প্রকল্পটির বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন?

সৌম্য দত্ত: হ্যাঁ, আমি সর্বান্তঃকরণে রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন জানাই। এর পেছনে অনেকগুলো শক্তিশালী কারণ রয়েছে, যেমন :

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত প্রভাবের ফলে এবং এই হুমকির শিকার হওয়া অন্যতম দেশ বাংলাদেশ হওয়ায় (কিছু তালিকা অনুযায়ী ১৯৬টি দেশের মধ্যে এই দেশের ঝুঁকি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থা যেন ধ্বংস না হয়। সুন্দরবন বড় ঝড় ও বন্যার মত দুটি জলবায়ুগত দুর্যোগের ক্ষেত্রে বড় সুরক্ষা (ইউএনআইএসডিআর উপাত্ত)। একই কারণে আমরা ভারতীয় সুন্দরবন অংশের কাছে এ ধরনের কোনো কয়লা প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাব।

খ) একটি কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র মিলিয়ন টন পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ; কিন্তু এটাই বাংলাদেশের জন্য প্রধান মাথাব্যথার বিষয় নয়। এই দেশের কার্বন নির্গমন হার যথেষ্ট কম। রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ হারে এসিডিক অক্সাইড নির্গমন করবে, যা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করবে। এর ফলে সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীর পানির অম্লতাও বৃদ্ধি পাবে, যা পিএইচ ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বনের ধ্বংসের হার বাড়িয়ে তুলবে। কেবল একটি রামপাল প্রকল্পের মাধ্যমে না হলেও ওই এলাকায় যে দ্রুত জমি দখল ও শিল্পায়ন ঘটছে, তার মাধ্যমেই এই ঘটনাকে ত্বরান্বিত হবে।

গ) একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুন্দরবনের মতো এই জটিল বনাঞ্চল প্রক্রিয়াকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দুরূহ।

ঘ) ভারতীয় অংশের সুন্দরবন, যা ইতিমধ্যে উচ্চ পিএইচ মানের কারণে নৃতাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা আরো বেশি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

ঙ) দরিদ্র ও প্রকৃতিনির্ভর লাখ লাখ মানুষের জীবিকা ধ্বংস/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং যে দেশ এখন পর্যন্ত নাগরিকের মৌলিক সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাচ্ছে সেই দেশের জন্য এ ধরনের প্রকল্প ভয়ংকর অপরাধ।

সৌম্য দত্ত: প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষক এবং গণবিজ্ঞানকর্মী, দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু ন্যায্যতা, বিদ্যুতের দূষণ এবং বাস্তুতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ভারত ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
ইমেইল: soumyadutta.delhi@gmail.com

মাহা মির্জা: জ্বালানী ও অর্থনৈতিক বিষয়ক গবেষক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা।
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী: লেখক, অনুবাদক
ইমেইল : chaity.srsp@gmail.com